ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 851- 858
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.076

বাঙালির হিমালয়-প্রবজ্যা : ভারতাত্মার সন্ধান (নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনি অবলম্বনে)

সুস্মিতা দে, *অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bengalis are a travel-loving people, and Bengali literature reflects this passion. From ancient to medieval and modern periods, travel literature in Bengali has left its mark. This travel, however, is not merely driven by the urge for self-satisfaction; it extends further to embrace the distant with an aesthetic fondness. It represents a journey from the small to the expansive, an embrace of the greater world. This personal consciousness, transformed into a collective sentiment, is vividly expressed in Bengali travel literature.

Since the dawn of civilization, the Himalayas have been deeply intertwined with our existence, not just for spiritual reasons but also for the grandeur of their natural beauty. The Himalayas have become synonymous with the Indian soul, woven into Indian philosophy, literature, and culture. References to the Himalayas can be found in works like the Mahabharata, Kumarasambhavam, and Meghadutam. Situated in the northern part of India, the Himalayas form the backbone of numerous sacred sites, rivers, and other mountain ranges. For instance, in Kedarkhand, the Himalayas are divided into five distinct sections, which are discussed in greater detail elsewhere.

Bengali travellers have endeavoured to comprehend the existence of the Himalayas through their own experiences. Notable figures such as Jaladhar Sen, Umaprasad Mukhopadhyay, and Probodh Kumar Sanyal have contributed significantly to this tradition. However, these adventurers did not seek to envision an abstract divine realm or attain metaphysical realization of the infinite cosmos. Instead, their journeys were fuelled by an unspoken, sublime longing, a euphoric thirst for the majestic, whose true source is known only to the Himalayas themselves.

Keywords: Himalaya, Bhraman, Sahitya, Anubhab, Bhratiyo.

হ-য-ব-র-ল-এর ‘গেছোদাদা’-কে আশা করি সকলেরই মনে আছে। ‘কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?’ – এই প্রশ্নের উত্তরে বেড়াল বলেছিল, ‘...মনে করো তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকেষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হওয়ার জো নেই।'[১] গেছোদা-র এই 'ধাত' যেন প্রত্যেক বাঙালির মধ্যেই যুগ যুগ ধরে ভ্রমণের নেশা বা পিপাসা হয়ে বাস করছে। সমাজ, অর্থনীতি এবং অধ্যাত্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তার এই ভ্রমণপিপাসা বার বার নানা ছাঁদে দেখা দিয়েছে কখনো 'হাওয়াবদল'-এর ঢঙে, কখনো 'ফ্যামিলি ট্রিপ'-এর আদলে আবার কখনও 'তীর্থযাত্রা' বা 'প্রবজ্যা'-র মোড়কে। বর্তমান প্রবন্ধে ভ্রমণপিপাসার সেই বিবিধ বহিঃপ্রকাশকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের নিরিখে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমন এক স্থান, যেখানে গিয়ে ভ্রমণ শুধুমাত্র শখের 'বিলাস' হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে 'এষণা'। সেই স্থান হল 'ভারতাত্মা হিমালয়'। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই হিমালয়ের পরিসরে এসে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম অনুভব করেছেন। গৃহের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে মহাস্থবির হিমালয়ের কোলে প্রত্যেকেই যেন নিজের বৃহত্তর স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। ফলে শুধু প্রকৃতিই নয় ভারতবর্ষও তাঁদের কাছে নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। সে ভারতবর্ষ নিছক দেশ নয় দেশের আত্মা, যার বিস্তার কোনও রাজনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ নয় বরং বৃহত্তর অর্থে এ যেন রূপান্তরিত মানবাত্মারই বহিঃপ্রকাশ।

বাঙালি জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যে 'ভ্রমণ' একটি দ্বিমুখী ভাবসংবাহক বিষয়। অন্তর্মুখী দশায় এই ভ্রমণের বিস্তার কখনও ইড়া-পিঙ্গলায় *(চর্যাপদ)* শ্বাসবায়ুর গমনাগমনে; কখনও রাধার কৃষ্ণবিমুখতা থেকে কৃষ্ণমুখীনতায় *(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)* কিংবা দীর্ঘ বিরহের অমানিশার মধ্য দিয়েই বিনোদিনীর জ্যোৎস্নাভিসারে *(বৈষ্ণবপদাবলী)*। আবার এর বহির্মুখী দশায় কখনও শ্রীচৈতন্যের নীলাচল গমন *(চৈতন্যচরিত সাহিত্য)* বা শ্রীরামের বনবাস *(শ্রীরাম পাঁচালী)* অথবা পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান *(কাশীদাসী মহাভারত)* থেকে আরম্ভ করে চাঁদবেনের বৈদেশিক বাণিজ্য *(মনসামঙ্গল)*, ধনপতির সিংহলযাত্রা *(চণ্ডীমঙ্গল)* হয়ে হুমরাবেদের সবান্ধব ভাসমান জীবনযাত্রা *(মহুয়া পালা)* পর্যন্ত। উল্লিখিত উদাহরণ অনুযায়ী ভ্রমণ বিষয়টি দ্বিমুখী হলেও এর প্রভাব এবং প্রতিফল একমুখী – স্ববৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে মিশে যাওয়া। বাঙালি জীবনে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে এই ধরণের অনুভূতি দেখা গিয়েছে সাধারণত তীর্থযাত্রা বা প্রবজ্যাকে কেন্দ্র করে। আবার সেই যাত্রা যখন হিমালয়ের অভিমুখে হয়েছে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে মানুষ নিজের উপলব্ধি এবং অভীপ্সাকে একাত্ম করে ফেলে এক নতুনতর জগতের সন্ধান পেয়েছে। তাঁদের সেই ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতিই কালান্তরে ধরা দিয়েছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে। বর্তমান প্রবন্ধেও হিমালয়-ভ্রমণের নেপথ্যে-থাকা যাত্রীদের ভারতাত্মা সন্ধানের স্বরূপকে, ভ্রমণসাহিত্যের সাহায্যেই নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হিমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ভ্রামণিকের অন্তর্জগতে যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন দেখা দেয়, তার উৎস শুধুমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য নয় বরং তার চেয়েও আরও বেশি কিছু। এমন কিছু যা সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। মহাভারত-পরবর্তীকালে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' এবং 'মেঘদূতম্' ছাড়া কোনও সাহিত্যে সেই অর্থে হিমালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরপর কালক্রমে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে হিমালয় পুনরায় যেন মানুষের প্রকৃতিকেন্দ্রিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই সময় থেকেই বেশকিছু তীর্থযাত্রী হিমালয় ভ্রমণ করে তাঁদের যাত্রাপথের বিবরণ এবং হিমালয়-দর্শনে তাঁদের ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ফলে আমাদের অন্তঃস্থল থেকে যেন হিমালয়ের পুনরুত্থান ঘটে –

> ...দেবতাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র রূপে কল্পিত হিমালয় শেষে ভারতীয় আধ্যাত্মিকের কাছে প্রায় একটি তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। যোগীর জন্য নির্জন নিভৃত এবং তপস্বীর জন্য সুমহিম মৌন কন্দরে কন্দরে ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র হিমালয়। এই হিমালয় হলো বৈরাগ্যের আশ্রয়, জীবন্মুক্তির নীড়। সংসারের ভোগ আর কামনার কোলাহল থেকে স'রে গিয়ে শান্তরসাস্পদ কোন আশ্রয় যদি পেতে ইচ্ছা করে, তবে পাওয়া যাবে ঐ শুভ্র সমুন্নত হিমালয়েরই কোন নিভৃতে। হিমালয়ের নিসর্গরূপের মধ্যেই যেন এমন কিছু রয়েছে, যার প্রসাদে তত্ত্বান্বেষী আধ্যাত্মিক তাঁর অন্তরের অতি নিকটেই এক বিরাটের সান্নিধ্য সহজেই অনুভব করতে পারেন।[২]

ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে এই অনুভূতি নিয়ে হিমালয়-দর্শন করেছেন এবং এই অনুভূতিই অবশেষে আত্মিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের পর্যটকদের মনেও হিমালয় তার আত্মিক আবেদন জাগিয়ে তুলেছে। হিমালয়ের সঙ্গে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের পরিচিতি খুব বেশি দিনের না হলেও হিমালয়-বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রিক ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের উক্তি থেকে জানা যায় যে, হিমালয়ের নৈসর্গিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের উপলব্ধি অনেকটা একই রকম। তবে ভারতীয়দের মধ্যে হিমালয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে, তা কেবলমাত্র এর উত্তুঙ্গ শিখরের জন্য নয় বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিপুল অংশে হিমালয় পর্বতের উল্লেখ এবং প্রভাব একে ভারতীয়দের কাছে নিছক একটি 'ভঙ্গিল পর্বত' করে রাখেনি বরং করে তুলেছে 'ভারতাত্মা'। ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনে ভারতাত্মা হিমালয়ের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত যাবতীয় তীর্থ, নদনদী তথা অন্যান্য বিভিন্ন পর্বতশ্রেণির মেরুদণ্ড হল হিমালয় পর্বত। কেদারখণ্ডে হিমালয়কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা - ১. নেপালখণ্ড ২. মানসখণ্ড ৩. কেদারখণ্ড ৪. জলন্ধরখণ্ড ৫. কাশ্মীরখণ্ড। হিমালয় উপত্যকায় প্রবাহিত কালী নদীর উল্লেখ কেদারখণ্ডের ৪২তম অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক শ্লোকে রয়েছে। এই নদীর পূর্বভাগে রয়েছে নেপালখণ্ড। পশ্চিমোত্তর ভাগে রামগঙ্গা এবং নন্দকোট পর্যন্ত বিস্তৃত মানসখণ্ড, যাকে কূর্মাঞ্চল বা কুমায়ুন বলা হয়। কুমায়ুনের নৈনীতাল, আলমোড়া এবং পিথৌরাগড় জনপদ অবস্থিত। কুমায়ুনের পশ্চিম সীমা থেকে গঙ্গা, যমুনা এবং তমসা নদীর প্রবাহ পর্যন্ত কেদারখণ্ড। এই ভূখণ্ডে পৌড়ীগঢ়োয়াল, টিহরীগঢ়োয়াল, দেহ্‌রাদুন, উত্তরকাশী এবং চমেলী জনপদ অবস্থিত। কেদারখণ্ড থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেই পড়বে জলন্ধরখণ্ড। তারও পশ্চিমোত্তর সীমানায় অবস্থিত কাশ্মীরখণ্ড। ভৌগোলিক দিক থেকে কেদার, অন্যান্য খণ্ডগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কেদারখণ্ডের পূর্বোত্তর দিকে রয়েছে নেপাল এবং কুমায়ুনখণ্ড। পশ্চিমোত্তর দিকে রয়েছে জলন্ধর বা হিমাচল প্রদেশ এবং কাশ্মীরখণ্ড। কেদারখণ্ডে এই বৃহত্তর হিমালয়কেন্দ্রিক অঞ্চলের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক এবং ঐতিহাসিক সম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] প্রায় সব পুরাণ এবং কুমারসম্ভবম্-এর মতো কাব্যে হিমালয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় অন্যান্য সমস্ত পর্বতের চেয়ে আকারে বড়ো, তাই একে পর্বতরাজ বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিমালয় শুধুমাত্র একটি স্থাবর পর্বত নয়, এ যেন স্থিতধি সাধক। শিবমহাপুরাণে হিমালয়ের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, হিমালয় স্বয়ং রত্নাকর। যেন কোনও ঋষি পূর্ব এবং পশ্চিমের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছেন। ফলে তাঁর আবক্ষ স্বরূপটি হিমালয় শিখর

রূপে জেগে রয়েছে।[৪] হিমাচ্ছাদিত পর্বত হওয়ার কারণে একে হিমালয় বলা হয়েছে। মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবম্-এ হিমালয়কে 'দেবাত্মা' বলে সম্বোধন করেছেন।[৫]

এহেন স্থান যে যুগ যুগ ধরে স্বরূপসন্ধানী অভিযাত্রীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। উপরোক্ত স্থানমাহাত্ম্যকে পাথেয় করে যে বাঙালি ভ্রামণিকগণ হিমালয়ের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ। এঁদের ভ্রমণ-কেন্দ্রিক রচনায় হিমালয়-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফলে হিমালয় তখন আর ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ হয়ে থাকেনি, পরিণত হয়েছে ভারতাত্মায়। তবে আত্মার আধার যেমন আপাদমস্তক গোটা একটি শরীর, তেমনই উল্লিখিত লেখকদের রচনায় হিমালয়ের ভারতাত্মাস্বরূপ, তার বহিরঙ্গের অবয়বের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই লেখকেরা হিমালয়-যাত্রাকে আধ্যাত্মিক প্রবজ্যার স্তর থেকে বাঙালির সুদূর-পিয়াসের গন্তব্যে পরিণত করেছেন। তাঁদের লেখায় যেমন তাঁদের নিজেদের অনুভূতির কথা রয়েছে তেমনই যাত্রাপথের সাধারণ বিবরণ, যাত্রীগণের পথকষ্ট, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাত্রীদের অনুভূতির কথা স্থান পেয়েছে। আবার এইসব বিবরণের মর্মমূলে রয়েছে সেই ভারতাত্মা হিমালয়। এই অর্থে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা যেন বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গের পথে যাত্রা বা কেন্দ্রাতিগ থেকে কেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা।

কোনো অদৃশ্য ভূমার কল্পনা বা অনন্ত ব্রহ্মের দর্শনলাভ এই উল্লিখিত অভিযাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁদের হিমালয়-পর্যটনের নেপথ্যে রয়েছে এক অকথিত সুদূর-পিয়াসী পুলক যার উৎস সম্পর্কে জানে একমাত্র হিমালয় স্বয়ং। অপার কৌতূহলকে সঙ্গী করে তাঁদের যাত্রা এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে। কারোর ভ্রমণ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে, কেউ-বা পৌঁছে গিয়েছেন হিমালয়ের অন্তর্লোকে। হিমালয়বেষ্টিত অঞ্চলের আবহাওয়া, রুক্ষতা, দীপ্তি, প্রাকৃতিক শোভা – সবকিছু একে একে তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনির পাতা থেকে পাঠক চিত্তে প্রবেশ করেছে এবং তাকেও সেই দুর্গমের ডাক শুনিয়ে ঘর-ছাড়া করেছে। এই ধরনের লেখা পাঠ করতে করতে পাঠকও নিজেদের অজান্তেই কখন যেন তাঁদের সঙ্গী হয়ে পড়ে।

এই ধারার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *প্রবোধকুমার সান্যাল*। তাঁর *'দেবতাত্মা হিমালয়'* বইটি উপন্যাসের মতোই পাঠকের মনকে হিমালয়ের গভীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম। একাধারে কৌতূহল, বিস্ময় এবং মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখক ভ্রমণ করেছেন হিমালয়বৃত্ত। শারীরিক ভ্রমণ কখনও কখনও পরিণত হয়েছে মানস-ভ্রমণে যেখানে গন্তব্যে পৌঁছোনোর চেয়ে পৌঁছোনোর আকাঙ্ক্ষাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে ব্যাপক-বিস্তৃত হিমাচলের ভয়ংকর এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য লেখকের এষণা-শুদ্ধ অভিনিবেশে ধরা দিয়েছে। হিমালয়-ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রবোধকুমার লিখছেন –

> হিমালয় পর্যটক বলেই যে আমি সঠিক তীর্থযাত্রী- একথা সত্য নয়। তীর্থযাত্রাটা গৌণ, হিমালয় পর্যটন হলো মুখ্য। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের।...হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটামুটি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু বত্রিশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়নি। আমি ভক্তিভাসমান নই যে, মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর দেখামাত্র ভাবাপ্লুত চক্ষে অসাড় হয়ে যাবো। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ে কোথাও অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র

> দেখলে আমি আনন্দ পাই। ওর মধ্যে মানুষেরই মহিমাকে দেখতে পাই – যে-মানুষ দুঃসাধ্য পথে গিয়ে দেবস্থান বানিয়েছে।[৬]

এই গ্রন্থে লেখক তাঁর অর্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপ্ত প্রবজ্যাজীবনের হিমালয়কেন্দ্রিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সে হিমালয় দেবভূমি বা দেবাত্মার চেয়েও অনেক মহৎ, অনেক তীব্র তার আকর্ষণ। হিমালয়ের যাত্রাপথের বর্ণনা করতে করতে লেখক দেবভূমি থেকে মনোভূমিতে বিচরণ করেছেন। তাঁর ভাষার সুললিত বন্ধনে ভ্রমণকাহিনি অনেক বেশি বর্ণাঢ্য এবং সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। তাঁর নিবিড় অনুভূতি যেন অসহনীয় যন্ত্রণার মতোই প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির দুই খণ্ডে দেবতাত্মা হিমালয়ের মহিমা ও বিচিত্র রূপের বর্ণনা রয়েছে। লেখক কতটা আকুল হয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় বিচরণ করেছেন, তা এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে সহজেই বোঝা গিয়েছে। হিমালয়ের বিচিত্র উপত্যকা এবং তার বৈশিষ্ট্য লেখক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এর অন্যতম কারণ হল – পদব্রজের মাধ্যমে হিমালয়ের নৈসর্গিক রূপদর্শন। ফলে তাঁর লেখায় পথ কখনও কখনও গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হিমালয়ে লেখকের কাছে নিজের স্বরুপ কে ব্যক্ত করেছে। ফলে ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য পেরিয়ে হিমালয় হয় উঠেছে ভারতাত্মা। যাত্রাপথের প্রতিটি স্থানের নিজস্ব রূপ-বৈচিত্র্য লেখকের সুখপাঠ্য গদ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। *শখের পর্যটক* যে-সব পথে সাধারণত যায় না বা তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, লেখক সেইসব পথ ধরে গিয়েছেন উপত্যকার দুর্গমতম অন্দরমহলে।

উপরোক্ত লেখকের মতোই, হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্যের অপর একজন উল্লেখযোগ্য রচয়িতা *সমর গুহ।* ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত সমর গুহ একজন ভ্রামণিক হিসাবেও সুপরিচিত, বিশেষ করে তাঁর হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণবৃত্তান্ত *উত্তরাপথ* বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থের প্রথমেই লেখক হিমালয়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে একাধিক বার স্বীকার করেছেন –

> শিলামন্থনের অনন্ত তরঙ্গ: ঘন নীল সমান্তরাল বিলম্বিত হয়ে গেছে উত্তর আকাশে। নীচে জল। সপ্ত ধারায় নেমে আসছে সমতল ভূমিতে। তারপর বিস্তীর্ণ হয়ে ছুটে চলছে দুরন্ত প্রবাহে। হিমালয় নিঃসৃত গঙ্গা, - *ভারত-ইতিহাসের চিরন্তনী প্রাণধারা*! ... এ দুয়ার দিয়ে গঙ্গা নামছে। তারই পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একটি বিসার্পল পথ। হিমালয়ের বুকে যাওয়ার *যুগযুগান্তরের ঐতিহাসিক সরণী*।[৭]

লেখকের উত্তরাপথ ভ্রমণের ভৌগোলিক সীমা কেদার-বদ্রীনাথ থেকে শুরু হয়ে *প্রকৃতিময় তীর্থভূমি* সত্ পন্থ-এ এসে শেষ হয়েছে। উত্তরাপথ গ্রন্থে যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, পথের ভয়াবহতা, প্রতিকুলতা এবং প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্যময়ী রূপ বাঙময় হয়ে উঠেছে। হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভ করে লেখকের হিমালয়প্রীতি আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। সত্পন্থ যাত্রাপথের ভয়ংকর দুর্গমতা শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছে এবং সত্পন্থ দর্শনে অপরূপ প্রশান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে।

ভ্রমণের সুবিধার জন্য সঠিক পথনির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তরাপথ গ্রন্থে লেখকের অপূর্ব বর্ণনায় সামগ্রিক ভ্রমণ কাহিনিটিই যেন রেখাচিহ্ন-সহ প্রথাগত পথ নির্দেশে পরিণত হয়েছে। হিমালয় উপত্যকার

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, কোমল-কঠোর রূপ এবং ভ্রমণপিপাসুদের কাছে মূল্যবান কিছু অনুভূতির কথা রয়েছে। লেখক হয়তো কখনও কখনও পথের প্রতিকূলতায় শারীরিকভাবে জর্জরিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সেই যাতনা তাঁকে কখনোই হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি বিমুখ করেননি। কারণ লেখকের কোনও এক পরিস্থিতিতে এসে মনে হয়েছে এই সমস্ত প্রতিকূলতা হিমালয়ের সৌন্দর্য-সুষমার কাছে তুচ্ছ। লেখক সমর গুহ, হিমালয়ের উদার ঐশ্বর্যে অবগাহন করতে করতে এক সময় জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। আবার অচিরেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রগাঢ় প্রশান্তির স্তরে নিয়ে গিয়েছে।

এই পর্বের পরবর্তী লেখক হিসেবে সাহিত্যিক *চিত্তরঞ্জন মাইতির* কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর লেখা *শৈলপুরী কুমায়ুন* এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমায়ুন পার্বত্য এলাকার কয়েকটি শৈল-শহরকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন –

> "ভ্রমণ কাহিনীতে পায়ের চলাটাই ত সব নয়, মনের চলাটাই আসল। শুধু ঘর ছেড়ে বার হওয়া নয়, বাইরেকে ঘর করবার মত অন্তরের ঐশ্বর্য ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতাও চাই। প্রতি মুহূর্তে বাইরের সবকিছু রঙ ও রস ধরবার মত সজাগ মনের চোখ মেলে রাখতে না পারলে বিশ্বভুবন ঘুরেও কিছুই মেলবার নয়।...সেই মন যতখানি সজাগ, সজীব, সত্যাশ্রয়ী ও গভীর, ভ্রমণকাহিনীও ততখানি সার্থক। 'শৈলপুরী কুমায়ুন' এমনি একটি সার্থক ভ্রমণকাহিনী"।[৮]

লেখকের অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া এবং কৌসানি পাঠকের কাছে স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। গ্রন্থে কুমায়ুন উপত্যকার প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হয়ে উঠেছে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনিতে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে পরিশীলিত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ ঘটেছে।

গ্রন্থে লেখকের গভীর উপলব্ধির কথা বা ইতিহাস ও ভূগোলের বিবৃতি নেই ঠিকই তবে মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের চিত্র সেখানে ষোলো আনা স্পষ্ট। গ্রন্থে ভ্রমণের চেয়ে মানুষের কথাই বশি। লেখক নিজের সজীব, সত্যাশ্রয়ী ও গভীর মনের সহায়তায় মানুষের হৃদয়ের সংবাদই পরিবেশন করেছেন।

হিমালয়-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক *শঙ্কু মহারাজ বা জ্যোতির্ময় ঘোষদস্তিদার*। হিমালয় প্রদেশের পাঁচটি প্রয়াগের বর্ণনায় রচিত তাঁর *পঞ্চ প্রয়াগ* গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। এই পাঁচটি প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগের বর্ণনায় শঙ্কু মহারাজ বলেছেন –

> "আমাকে কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে দেবপ্রয়াগ। শুধু পুণ্যভূমি বলে নয়, দেবানুগ্রহের জন্য নয়, এর অপরূপ সৌন্দর্য ও অনাবিল শান্তির জন্য ! সুযোগ পেলেই আমি এখানে আসি। মুসৌরী না গিয়ে দেবপ্রয়াগে আসি। এই পাহাড়ী জনপদটির দেবোপম রূপের ছটায় বাসে বসেই আমার দুচোখ জুড়িয়ে যায়"।[৯]

সহজ-সরল-সুবোধ্য ভাষায় শঙ্কু মহারাজ তাঁর ভ্রমণ কাহিনি রচনা করেছেন। তবে অনেকের মতে পাঁচটি তীর্থের পৃথক বর্ণনায় গদ্যের গঠনশৈলীতে হয়তো কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। গ্রন্থের শিরোনামের মধ্যে পাঁচটি প্রয়াগের বর্ণনা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও পৃথকভাবে এই বর্ণনা অনেক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ হয়ে

ওঠেনি। কিন্তু এর ফলে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব শঙ্কু মহারাজের রচনায় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গ্রন্থে সুবিখ্যাত পাঁচটি প্রয়াগের কথা রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রয়াগের বর্ণনায় লেখক পৃথক শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। শিরোনামের ক্ষেত্রে Alliteration-এর ব্যবহারও লক্ষ করার মতো। লেখক কখনও ইতিহাস, কখনও পৌরাণিক কাহিনির সমন্বয়ে উল্লিখিত স্থানগুলির বর্ণনা করেছেন। তত্ত্ব এবং তথ্যের অপূর্ব মিশেল, *পঞ্চ প্রয়াগ* গ্রন্থের গুরুত্ব পাঠকের কাছে দ্বিগুণ করে তুলেছে। এর সঙ্গে গ্রন্থের শেষে কেদার-বদ্রী যাত্রার দিনপঞ্জী, কেদারনাথ-গোমুখী পদ-যাত্রার পথনির্দেশ এবং পথের নানা স্থানের পরিচয় গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ভ্রমণীকের কাছেই হিমালয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই স্থানের যাত্রাপথ, নদীবিধৌত উপত্যকা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তীর্থস্থান বারংবার ভ্রামণিকদের শুধুমাত্র বহির্মুখী যাত্রায় সীমাবদ্ধ না রেখে, তাঁদের ক্রমে অন্তর্মুখের অভিমুখে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এরপর তাঁরা যে হিমালয়কে দর্শন করেছেন তা কোনো ভৌগোলিক স্থান নয়, তাঁর অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই হিমালয় পাঠকদের কাছেও নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। হিমালয়ের যাত্রাপথের প্রান্তরে যেন এক অতিলৌকিক মাধুরী ছড়িয়ে রয়েছে।

উপরোক্ত প্রত্যেক লেখকের বর্ণনাভঙ্গি, পরিবেশন, সাহিত্যিক গুণাগুণ একেবারেই আলাদা। কিন্তু এই বিবিধের মাঝেও মিলনের সুরকে বেঁধে রেখেছে – হিমালয়। এখানেই হিমালয়-কেন্দ্রিক রচনা আর পাঁচ রকমের ভ্রমণকাহিনি থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রত্যেক লেখকের মধ্যে হিমালয়যাত্রার পৃথক পৃথক কারণ ও উপলব্ধি দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের উপলব্ধির মূলে রয়েছে কখনও হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবার কখনও তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। তবে হিমালয়কে অতিক্রম করে কোনও লেখকই উপলব্ধির কোনো নতুন স্তরে পৌঁছোতে পারেননি। এবার যদি তাঁদের উপলব্ধির কথা বলা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কখনো হিমালয়ের প্রাকৃতিক মহিমা আবার কখনও তার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, বাঙালি লেখকদের এই বর্ণনার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকবারই হিমালয়ের যেন নবকলেবরে ধরা দিয়েছে। এই নবকলেবর হল হিমালয়ে স্বরূপ। সমগ্র ভারতের শীর্ষমুকুট স্বরূপ হিমালয় যুগ যুগ ধরে ভারতের অধ্যাত্মবাদ, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে লালন-পালন করেছে, তাকে পরিপুষ্ট করেছে। ভারতের সনাতন ধর্মের আদিগুরু রূপে হিমালয় কখনো দেবভূমি আবার কখনো কর্মভূমি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই ভারতীয় ভাবনায় হিমালয় শুধুমাত্র শৈলস্তুপ নয়, সে ধ্যানমগ্ন, স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ ঋষি। এমন ঋষি যিনি বহু মন্বন্তর দেখেছেন অথচ তাঁর সাক্ষীভাব কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতের সনাতন সভ্যতার সমস্ত রহস্য তিনি জানেন কিন্তু তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে এক পবিত্র, অখণ্ড মৌনতা। তাই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য বহুদিন ব্যাপী চলছে হিমালয় অভিযান। এই অভিযান ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে শৃঙ্গজয় কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অসীমের রহস্য উন্মোচন। এই রহস্যের সন্ধানেই উল্লিখিত লেখকগণ হিমালয় যাত্রা করেছেন এবং তাঁদের অনুভূতির পরিসরে যথাসাধ্য হিমালয়ের ভারতাত্মা স্বরূপকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এই অর্থে তাঁদের অভিযান স্বরূপোদঘাটনের সাধনায় পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সুকুমার, *হযবরল*, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং. প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১১।
২. ঘোষ, সুবোধ, *হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং*, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ. ২ – ৩।
৩. অগ্রে মানস প্রস্তাবং তথা নেপাল কে মুনে। কশ্মীরে চৈব প্রস্তাবে জালন্ধ্রে চ তথা পুনঃ।। / তথা কেদারপ্রস্তাবে কথিতানি ময়াদ্য তে। (কেদারখণ্ড ২০৪/৫৬ - ৫৭)
৪. অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি বৈ গিরীশো হিমবান্মহান্। পর্বতো হি মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ সমৃদ্ধিভাক্।। (শিবমহাপুরাণ, পার্বতীখণ্ড ১/১৪)।
৫. অস্ত্যুত্তরস্য দিশি দেবাত্মা হিমালয়ো নামও নগাধিরাজঃ। পূর্বাপরো তোয়নিধি বগাহ্য স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব মানদণ্ড।। (কুমারসম্ভবম্ ১/১)
৬. সান্যাল, প্রবোধকুমার, *দেবতাত্মা হিমালয়*, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২, পুর্বভাষণ [প্রথম খণ্ড]।
৭. গুহ, সমর, *উত্তরাপথ*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১।
৮. মাইতি, চিত্তরঞ্জন, *শৈলপুরী কুমায়ুন*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ভূমিকা।
৯. মহারাজ, শঙ্কু, *পঞ্চ প্রয়াগ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. রায়, সুকুমার, *হযবরল*।
২. ঘোষ, সুবোধ, *হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং*।
৩. সান্যাল, প্রবোধকুমার, *দেবতাত্মা হিমালয়*।
৪. গুহ, সমর, *উত্তরাপথ*।
৫. মাইতি, চিত্তরঞ্জন, *শৈলপুরী কুমায়ুন*।
৬. মহারাজ, শঙ্কু, *পঞ্চ প্রয়াগ*।

সহায়ক পত্রপত্রিকা (বৈদ্যুতিন):

১. আনন্দবাজার, *পায়ে হেঁটে গাড়োয়াল হিমালয়ের বাগিনি হিমবাহের অন্দরে* (https://www.anandabazar.com/travel/holiday-trips/holiday-trip-to-garhwal-himalaya-dgtl-1.712202)
২. বর্তমান, *মোহিনী হিমালয়*
(https://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=69&nID=206743P=1&nPID=20200109#google_vignette)